দিল্লীর তিন সম্রাট

মোবারক হোসেন খান

দিল্লীর তিন সম্রাট

মোবারক হোসেন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

দিল্লীর তিন সম্রাট

মোবারক হোসেন খান

ইফাবা প্রকাশিত—৩১৭

ইফাবা শিশু-কিশোর গ্রন্থ—৬৩

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮২

প্রকাশক : মোসলেম উদ্দিন
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা-২

ছবি অংকন : হাশেম খান

ব্লক : গ্রীন হরাইজন, ৬৩, রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা-১

মুদ্রণ : (প্রচ্ছদ) মেসার্স গ্রাফিক আর্টস, ৪৫, দিলখুশা
বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২
(ভেতরের) মেসার্স সুরমা আর্ট প্রেস,
১৯/১, আই, শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-৫

বাঁধাই : হারুন এণ্ড সন্স, ২১/৪ পাঁচভাইঘাট লেন, ঢাকা-১

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫২৫০ কপি

মূল্য—৫.০০

DILLEER TIN SAMRAT : Written by Mobarak Hossain Khan, Language Bengali (History of Three Great Emperors of Delhi), Published by Moslemuddin, Shishu- Kishore Grantha Prokashana, Islamic Foundation Bangladesh, Dacca. Price. **Tk. 5·00**

উপহার

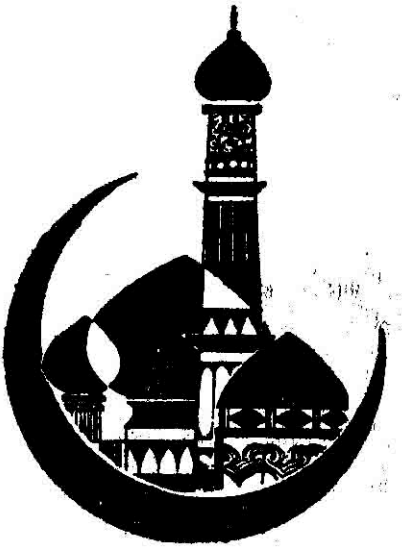

রিমি, রূপক ও রাজিত কে,

—আব্বা

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস অতীত ঘটনার ক্রম বিবরণ। ধারাবাহিক বর্ণনা।

আগের দিনে রাজা-বাদশাহ্‌রা দেশ শাসন করতেন। তাঁদের উজির-নাজির-রাজন্যবর্গ ছিলো। তাঁদের ঘটনা আগে ঘটে গেছে। তাই বর্তমানে তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস পড়ে আমরা অতীতের বিখ্যাত রাজা-বাদশাহ্‌দের দেশ পরিচালনার বিবরণ জানতে পারি। তাঁদের শাসন ব্যবস্থা, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারি। শুধু তাই নয়, তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ আর বীরত্বের কাহিনীও ইতিহাসে লেখা থাকে। আমরা ইতিহাস থেকে সে-সকল কাহিনী জানতে পারি। তাছাড়া, আরো কতো যে স্মরণীয় ঘটনার কথা ইতিহাস থেকে আমরা পেয়ে থাকি, তার ইয়ত্তা নেই। তাই আমাদের জীবনে ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ-কথা মনে রেখেই আমরা 'দিল্লীর তিন সম্রাট' ইতিহাস গ্রন্থটি শিশু-কিশোর পাঠকদের জন্য প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। অনেক বড় বড় বাদশাহ দিল্লীর মসনদ অলংকৃত করেছেন। তেমনি তিনজন বিখ্যাত বাদশাহ্‌র কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'দিল্লীর তিন সম্রাট'।

আশা করি, বইটি শিশু-কিশোরদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটাবে। তাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে।

'দিল্লীর তিন সম্রাট' যাদের জন্য প্রকাশিত হলো, তাদের কাছে সমাদৃত হবে বলে বিশ্বাস রাখি।

মোসলেম উদ্দিন

সূচীপত্র

- বাবর ঃ ৯
- হুমায়ুন ঃ ২৫
- শের শাহ ঃ ৪০

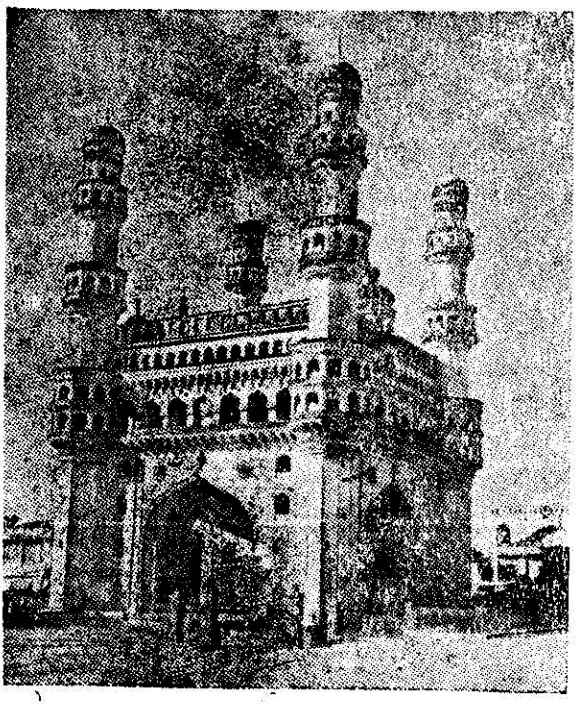

হায়দরাবাদের চার গম্বুজ মসজিদ (ভারত, ১৫৯১)

আগের কথা আগে বলে নিই ঃ

ইতি-হ-আস—এই তিনটি শব্দ জুড়ে ইতিহাস কথাটা হয়েছে ; তার অর্থ এই-ই ছিলো। এখন প্রশ্ন হলো, কি ছিলো ? তোমরা রাজারাণীর গল্প শুনেছো। অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প। সেই গল্পের রাজা খুব নামদার ছিলেন। তাঁর হাতীশালায় হাতী ছিলো, ঘোড়াশালায় ঘোড়া। তাঁর দাপটে বাঘে-মোষে একঘাটে পানি খেতো। রাজপ্রাসাদে ফুটফুটে সুন্দরী রাজকন্যা ছিলো। একদিন রাজকন্যাকে এক দৈত্য চুরি করে নিয়ে গেলো। ভিন দেশের এক রাজকুমার সেই দৈত্যকে মেরে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে আনলো। রাজা মহাখুশী হলেন। তিনি রাজকুমারের সংগে রাজকুমারীর বিয়ে দিলেন। সেই সংগে রাজকুমারকে অর্ধেক রাজত্ব দিলেন। গল্প শেষ হয়ে গেলো।

কি সুন্দর গল্প ! কিন্তু এটা হলো রূপকথার গল্প। মানুষের তৈরী গল্প। এই গল্পের কোনো ঘটনাই সত্য নয়। মানুষের মনগড়া। কিন্তু অনেক ঘটনা আছে, যা শুনতে রূপকথার মতোই সুন্দর অথচ সত্য। সেগুলো হলো বাস্তব গল্প। ঐতিহাসিক ঘটনা। এ সকল ঘটনা অতীতে সত্যি সত্যি ঘটেছিলো। আর অতীতের এই সত্য ঘটনাই হলো ইতিহাস। অর্থাৎ অতীতে এই-ই ছিলো।

রূপকথার গল্পের রাজার মতোই ইতিহাসের সত্য ঘটনাগুলোও রাজা-বাদশাহ্‌দের বীরত্বে ভরপুর। দিল্লীর সম্রাটদের সত্য কাহিনীগুলোও অনেকটা রূপকথার মতো। পার্থক্য শুধু, তাঁদের কাহিনীগুলো সত্য। আর তাই তাঁরা ইতিহাসের নায়ক। সত্য ঘটনার নায়ক। ইতিহাসের সেই সত্য ঘটনাই তোমাদের বলছি, শোনো।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বাবর। তাঁর আসল নাম যহীরউদ্দীন মুহাম্মদ। বালক যহীরউদ্দীনকে তাঁর আম্মা আদর করে ডাকতেন 'বাবর'। তুর্কী ভাষায় বাবর মানে 'সিংহ'।

বাবরের শরীরে সিংহের ন্যায় শক্তি ছিলো। দু'বগলে দু'জন মানুষ নিয়ে খুব সহজে তিনি দেয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন।

বাবরের পূর্বপুরুষ

বাবর ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট। ১৪৮২ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উমর শেখ মির্জা। তিনি ছিলেন তাতার সম্রাট তৈমুর লংয়ের বংশধর। আর তাঁর মা ছিলেন মোংগল সর্দার চেংগিস খাঁর বংশধর। তাঁর রক্তে ছিলো দুই যোদ্ধা বংশের রক্তধারা।

সম্রাট বাবর

বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা ছিলেন তুর্কিস্তানের ফারগনা রাজ্যের অধিপতি। ফারগনা ছিলো একটি ছোট্ট রাজ্য। বাবরের শৈশবকালের দিনগুলো এখানে বেশ সুখেই কাটছিলো। কিন্তু হঠাৎ সে সুখে বাধা পড়লো।

উমর শেখ মির্জা একদিন তাঁর পোষা কবুতরগুলোকে দানা খাওয়াচ্ছিলেন। কবুতরের খাঁচাটি হঠাৎ উপর থেকে খসে গিয়ে তাঁর ওপর পড়লো। দারুণ আঘাত পেলেন তিনি এবং সেই আঘাতে ইন্তেকাল করলেন। বাবরের বয়স তখন মাত্র এগারো বছর।

ফারগনার অধিপতি

পিতার ইন্তেকালের পর কিশোর বাবর ফারগনা রাজ্যের মসনদে বসলেন। বাবরের বয়স তখন বারো বছর। একটি রাজ্য পরিচালনার মতো বুদ্ধি তখনো তাঁর হয়নি। ফলে, জ্ঞাতি দুশমনরা তাঁর রাজ্য দখল করে নেয়ার চক্রান্ত শুরু করলো।

বাবর বয়সে ছোট। তবু সাহসী ও বুদ্ধিমান বলে সর্দাররা তাঁকে মান্য করেন। তাঁরা রাজ্য পরিচালনায় তাঁকে উপদেশ ও উৎসাহ দেন। তাঁদের পরামর্শ মতো বাবর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

জ্ঞাতি দুশমনদের পরাজিত করে বাবর রাজ্য জয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি সমরখন্দ দখল করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু লড়াইয়ে সফল হতে পারলেন না। পরের বার অবশ্য তিনি লড়াইয়ে জয়ী হন ও সমরখন্দ জয় করেন। এই সমরখন্দে থাকতে গিয়ে তিনি নিজের রাজ্য ফারগনা হারান। লড়াই করেও তিনি ফারগনা উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি রাজ্যহারা হলেন।

ফারগনা বাবরকে ছাড়তেই হলো। কিন্তু তাঁর সর্দারগণ তাঁকে ছাড়লেন না। তাঁরা রাজ্যহারা বাবরের সংগেই রইলেন। বাবরের ছোট্ট সৈন্য দলটিও তাঁর অনুগত রইলো। কিন্তু যাঁর দেহে আছে তৈমুর আর চেংগিসের রক্ত, তিনি কি রাজ্য আর সিংহাসন ছাড়া থাকতে পারেন? তাই আবার নতুন উদ্যমে তিনি রাজ্য জয়ের পথে পা বাড়ালেন।

কাবুল জয়

তিনি অনুগত সর্দারগণকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ঠিক হলো, তাঁর জন্য আর একটা রাজ্য চাই।

তিনি ইতিমধ্যে পিতৃরাজ্য ফারগনা পুনরায় অধিকার করেন। কিন্তু বছর দুয়েক পর আবার রাজ্যটি তাঁর হাতছাড়া হয়। এর বছর খানেক পরে তিনি পুনরায় সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু সমরখন্দ আবারও তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। তিনি ফারগনা তিনবার দখল করেন এবং তিনবারই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। এই পরাজয়ের পরও তিনি উদ্যম না হারিয়ে পুনরায় কাবুল আকমণ করেন এবং কাবুল জয় করেন।

নতুন রাজ্যের মসনদে বসে তিনি বাদশাহ্ খেতাব ধারণ করেন। কাবুলের বাদশাহ্ থাকাকালীন তিনি পারশ্যের শাহ ইসমাইল সাফাভীর সাহায্যে বোখারা ও সমরখন্দ দখল করেন। বাবর ছিলেন সুন্নী মুসলমান। কিন্তু শাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি শিয়াদের মতো আচার ব্যবহার করতেন। ফলে, প্রজারা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। উজবেক নেতা শায়বানী খাঁ ছিলেন বাবরের পুরনো দুশমন। তিনি এই সুযোগে প্রজাদের উত্তেজিত করে তোলেন এবং বাবরের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁকে হারিয়ে দেন। বাবর আবার রাজ্যহারা হয়ে পড়েন। এ সব রাজ্য জয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে

বাবর এবার ভারতের দিকে নজর দেন। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে তখন রাজত্ব করতেন সুলতান ইব্‌রাহীম লোদী।

দিল্লী জয়

আফগান আমীরগণ ইব্‌রাহীম লোদীকে সুনজরে দেখতেন না। আবার ইব্‌রাহীম লোদীও তাদের তোয়াজ করে চলতেন না। কারণ, আফগান আমীরগণ ছিলেন দাম্ভিক আর সুলতান ছিলেন প্রভুত্বপ্রিয়। ফলে, আফগান আমীরদের সাথে তাঁর বিরোধ শুরু হলো।

পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ ছিলেন বিরোধী আমীরদের প্রধান। তিনিও ইব্‌রাহীম লোদীকে বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। ইব্‌রাহীম লোদীকে দিল্লীর সিংহাসন থেকে না সরানো পর্যন্ত তিনি মোটেই শান্তি পাচ্ছিলেন না।

দৌলত খাঁ বাবরের বীরত্বের খবর পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, একমাত্র বাবরই পারবেন ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করতে। তাই তিনি গোপনে বাবরকে ইব্‌রাহীম লোদীর রাজ্য আক্রমণ করতে অনুরোধ করে পত্র পাঠালেন।

বাবরের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে একটা সুন্দর কাহিনী আছে। বাবর আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করে বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌! আমার ভাগ্য-লিপিতে যদি তুমি ভারত-বিজয় লিখে থাকো, তাহলে তুমি আমার কাছে তার ইংগিতস্বরূপ কিছু আম আর পান পাঠিয়ে দিও। বাবরের কাছে আম আর পান এ দু'টো জিনিসই ছিলো ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু। আল্লাহ্‌র উপর তাঁর অসীম বিশ্বাস ছিলো। বাবরের মনের আশা সত্যি সত্যি ফলে গেলো। দৌলত খাঁ অনুরোধ পাঠাবার সময় মধুর পাত্রে ভরে কিছু কাঁচা-

পাকা আম ও পান তাঁর ছেলে দিলওয়ার খাঁর হাতে বাবরের কাছে পাঠিয়ে দেন। বাবর দৌলত খাঁর উপহার পেয়ে তক্ষুনি নতজানু হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে শোকরিয়া আদায় করেন এবং ভারত আক্রমণের দৃঢ় সংকল্প করেন।

বাবর বুঝতে পারলেন, দিল্লীর সিংহাসন জয় করার এটা অপূর্ব সুযোগ। তিনি দৌলত খাঁর অনুরোধ সাদরে গ্রহণ করলেন।

বাবর তাঁর শিক্ষিত ও সাহসী সৈন্যদল নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন। পথে লাহোর আর দীপালপুর অধিকার করলেন। বিজয়ী বাবর রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে দিল্লীর দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু দৌলত খাঁ শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করতে তিনি আর সাহস পেলেন না। ফলে, ইব্‌রাহীম লোদীর বিরুদ্ধে বাবরকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন।

বিচক্ষণ বাবর জানতেন, দৌলত খাঁর সাহায্য ছাড়া দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিলো খুব কম। ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করা মৃত্যুর শামিল। তাই তিনি আর অগ্রসর হলেন না। কাবুলেই ফিরে গেলেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

বাবরের মন থেকে কিন্তু দিল্লী জয় করার ইচ্ছা নিভে গেলো না। তিনি সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁর সে স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হয়েছিলো। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্‌রাহীম লোদীকে পরাজিত করে বাবর তাঁর সে স্বপ্ন সফল করেছিলেন।

পানি পথের প্রথম যুদ্ধ

১৫২৬ সালে বাবর পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। পানিপথ নামক জায়গায় ইব্‌রাহীম লোদীর সৈন্যদলের সংগে বাবরের সৈন্যদলের মোকাবিলা হলো।

বাবরের ছিলো প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য ও কয়েকটা বড় কামান। আর সুলতান ইব্‌রাহীম লোদীর ছিলো প্রায় এক লক্ষ সৈন্য ও শিক্ষা-প্রাপ্ত এক হাজারের এক বিরাট হস্তী-বাহিনী।

বাবরের সংগে কামান ছিলো। ইব্‌রাহীম লোদী কামানের ব্যবহার জানতেন না। বাবর যুদ্ধ-কৌশলে নিপুণ ছিলেন। তিনি ভাবলেন, বিরাট শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে। অতর্কিতে আক্রমণ করার সাজ-সরঞ্জামও তাঁর ছিলো। তাই তিনি শত্রু সৈন্যদের উপর দু'দিক থেকে হামলা চালালেন।

বাবরের অশ্বারোহী সৈন্যদল সুলতানের হস্তী-বাহিনীকে পেছন থেকে হামলা করলো। আর সে সংগে সম্মুখ ভাগ থেকে বাবর কামান দাগার নির্দেশ দিলেন।

কামানের গর্জন শুনে সুলতানের সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে পড়লো। হস্তী-বাহিনী ভীত হয়ে পালাতে শুরু করলো। ফলে, সুলতানের বিরাট সৈন্যদল শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলো।

সুলতান ইব্রাহীম লোদী বীরের মত লড়াই করে মৃত্যুবরণ করলেন। বীর-হৃদয় বাবর দিল্লীর সুলতানের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বীরের মর্যাদায় কাফন-দাফন দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

লড়াইয়ে জয়লাভ করে বাবর দিল্লীর মসনদে আরোহণ করলেন।

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষ বাবরের মন কেড়ে নিলো।

নতুন এই দেশটি সম্পর্কে বাবর তাঁর আত্ম-কাহিনীতে বলেছেন: আমি কাবুল থেকে হিন্দুস্তান অভিমুখে রওয়ানা হলাম। বাদাম চশমা ও জাগদালিকের পথ ধরে ছ'দিনের দিন আদিনাপুর পৌঁছলাম। এর পূর্বে কোনো উষ্ণ দেশ কিংবা হিন্দুস্তান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আদিনাপুর এসে যখন পৌঁছলাম, তখন এক সম্পূর্ণ অভিনব জগতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি দেখলাম, এ দেশের ঘাস পৃথক, এর বৃক্ষরাজি পৃথক, এখানকার পশুপাখী আলাদা, এর নদ-নদী আলাদা, আমি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি এ দেশকে ভালোবেসে ফেললাম।

নতুন দেশের মানুষ বাবরকে মুগ্ধ করলো। তিনি আর এ দেশ ছেড়ে যেতে চাইলেন না। তাঁর অনুরোধে অনুগত সর্দারগণও এ দেশেই

রয়ে গেলেন। বাবর এ দেশের মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির চিন্তায় মনোযোগী হলেন।

বাবর আগ্রা থেকে কাবুল পর্যন্ত অনেকগুলো সরাইখানা নির্মাণ করলেন। তিনি ঘোড়-সওয়ার দিয়ে আগ্রা থেকে কাবুলে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করার ব্যবস্থা করলেন। পত্র-বাহক ঘোড়-সওয়াররা পথের মধ্যে সরাইখানায় বিশ্রাম নিতো।

রাজপুতদের বিদ্রোহ

রাজপুতরা বাবরের সাথে দুশমনি শুরু করলো। মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন বিদ্রোহী রাজপুতদের দলপতি। রাণা সংগ্রাম সিংহ ভেবেছিলেন, বাবর লড়াইয়ে জয়লাভ করে নিজের দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু তা না করে তিনি বেশ আঁট-সাঁট হয়ে বসলেন। তাঁর কাছে লক্ষণ বড় ভালো ঠেকলো না। অতএব তিনি সকল রাজপুত নৃপতিদের এক-জোট করলেন। তাঁরা মিলিতভাবে বাবরকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি হলেন। সংগ্রাম সিংহ মিলিত রাজপুত বাহিনীর দলপতি নির্বাচিত হলেন। অনেক হিন্দু রাজাও তাঁকে মদদ যোগাবার ওয়াদা দিলেন।

১৫২৭ সালের মার্চ মাসে বাবর আর রাণা সংগ্রাম সিংহের মধ্যে লড়াই শুরু হলো। আগ্রার নিকটে খানোয়ার ময়দানে তাঁরা মুখোমুখি হলেন।

বাবর লড়াই শুরু করবার আগে তাঁর আমীর ও মন্ত্রণাদাতাদেরকে এক পরামর্শ বৈঠকে তলব করলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে তিনি ভারতের ভূমিতে মুসলমান সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। বাবর সেই পরামর্শ বৈঠকে বলেছিলেন: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের

মুসলিম বাদশাহ্‌গণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যদি পশ্চাদ্‌পসরণ করি, তাহলে তাঁদের চোখে চিরদিনের জন্য আমি ভীরু ও দোষী হয়ে থাকবো। তাছাড়া, পৃথিবীর লোকদের কটুবাক্য আর উপহাস ও তিরস্কারের কথা ছেড়ে দিলেও হাসরের ময়দানে আমি এর কোনো জবাবদিহি করতে পারবো না। ইসলামের একজন বাদশাহ্‌ হিসেবে লড়াইয়ের ভয়ে আমি আমারই ধর্মের লোকদের ছেড়ে পলায়ন করতে পারি না। আমি একদল কাফেরের সম্মুখ থেকে কোনো জেহাদ না করেই আর মহানবীর আইনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামান্যতম কৈফিয়ত ছাড়াই পলায়ন করবো, আর এ দেশের মানুষকে কাফেরদের নিপীড়নের মুখে ফেলে যাবো, তা হয় না। জেহাদ ঘোষণা করে শহীদ হবার এই তো উপযুক্ত সময়।

রাজপুত সৈন্যরা বেশ সুশিক্ষিত ছিলো। কিন্তু বাবরের রণ-কৌশলও ছিলো অত্যন্ত উন্নত ধরনের। মোগল বাহিনীর সংগে রাজপুত সৈন্যদলের ভীষণ লড়াই শুরু হলো।

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি বাবরের ছিলো অপরিসীম আস্থা আর অগাধ বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র রাহে তিনি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। লড়াইয়ের ময়দানেও তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি অপার বিশ্বাস রাখতেন। আর তাই রাজপুত সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়বার সময় লড়াইয়ের ময়দানে তাঁর সৈন্যদের তিনি বলেছিলেন ঃ মানুষ জীবনে একবারই মাত্র মৃত্যুবরণ করে। আর জন্মিলে একদিন মরতে হবেই। কেবল আল্লাহ্‌ই চিরদিন বেঁচে থাকবেন। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে না। কাপুরুষের মৃত্যুর চেয়ে বীরের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। আর মুসলমান কখনো লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে যায় না। আসুন, আমরা সকলে একযোগে আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করি, আমাদের মধ্যে একজনও এ যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরাবো না।

বাবরের উদাত্ত আহবানে মোগল সৈন্যরা প্রাণপণ লড়াই করতে লাগলো। তারা খুব সহজেই রাজপুতদের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলো।

বাবর পুরনো রণ-কৌশল প্রয়োগ করলেন। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী আচমকা পেছন থেকে রাজপুত বাহিনীকে আক্রমণ করলো। সাথে সাথে সম্মুখ দিক থেকে কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হলো। ফলে, রাজপুত বাহিনী বাধ্য হয়েই পরাজয় বরণ করলো। রাণা সংগ্রাম সিংহ পালিয়ে গেলেন। দলপতির অভাবে রাজপুত আর হিন্দু রাজাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে লাগলো।

তারপর এলো রাজা মেদিনী রায়ের পালা। তিনি মালবে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বাবর তাঁকে পরাজিত করে ১৫২৯ সালের জানুয়ারী মাসে চান্দেরী দুর্গ দখল করলেন। ফলে, রাজপুতদের শক্তি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলো।

বিহার ও বাংলা অধিকার

এদিকে ইব্‌রাহীম লোদীর ভাই মাহ্‌মুদ লোদী বিহারে আশ্রয় নেন। এক লাখ সৈন্য তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলো। অনেক আফগান সর্দারও যোগ দিয়েছিলেন তাঁর দলে। ১৫২৯ সালে গোগরার যুদ্ধে বাবর তাঁদের হারিয়ে দিলেন। বিহার তাঁর দখলে এলো। এরপর বাংলার সুলতান নসরত শাহ্‌র সংগে বাবরের এক সন্ধি হলো। তাঁরা কেউ পরস্পরের রাজ্য আক্রমণ করবেন না বলে রাজী হলেন।

বাবরের বিদ্যানুরাগ

বাবর তাঁর রণ-কৌশল ও বিচক্ষণতার বলে ভারতবর্ষে এক সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ও রণ-নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই পড়াশুনা করে কাটাতেন। তিনি নিজেই নিজের জীবন-কথা লিখেছিলেন। তাঁর সে গ্রন্থের নাম' তুযুক-ই-বাবর' বা বাবরের আত্মজীবনী।

'তুযুক-ই-বাবর' একটি অত্যন্ত মূল্যবান জীবনী গ্রন্থ। বাবরের জীবনের ঘটনাবলী এ বইয়ে সুন্দরভাবে লেখা রয়েছে। তাছাড়া, সে সময়কার সমাজ ও ইতিহাসের কথাও এ বই পড়ে জানা যায়।

বাবর প্রকৃতিকে খুবই ভালবাসতেন। বাগান তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। তিনি আগ্রাতে একটা বিরাট বাগান তৈরি করেছিলেন। বাগানটিকে তিনি নানা ধরনের গাছ ও ফুলে সুশোভিত করে তুলেছিলেন। ফোয়ারার পানি বাগানটিকে শান্ত-স্নিগ্ধ করে রাখতো। জন-কোলাহলের আড়ালে এ বাগানে বসে একাকী সময় কাটাতে বাবর খুব ভালোবাসতেন।

বাবর প্রজাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিজের চোখে দেখবার জন্য ছদ্মবেশে রাজধানীতে ঘুরে বেড়াতেন।

রাজপুতরা বাবরকে মোটেই সুনজরে দেখতো না। তাই তারা বাবরকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করছিলো।

বাবরের সাহসিকতা

সেই ষড়যন্ত্রের একটি কাহিনীর কথা বলছি, শোনো।

একজন রাজপুত যুবক বাবরকে কতল্ করার জন্য দিল্লী রওনা হলো। সে ভেবেছিলো, দিল্লীতে গেলে বাবরকে হত্যা করা সহজ হবে। কারণ, রাতে রাজধানীর পথে পথে ছদ্মবেশে সম্রাটের ঘুরে বেড়ানোর কথা সে শুনেছে। রাজপুত যুবক তার পোশাকের ভেতর একটা ছুরি লুকিয়ে নিলো। তারপর দিল্লীর পথে সম্রাটকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

একদিন এই যুবক দিল্লীর এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথচারীদের লক্ষ্য করছিলো। তাদের মধ্যে সে সম্রাটকে খুঁজে ফিরছিলো। এমন সময় একটা হৈ চৈ শুনতে পেলো। পথচারীদের দৌড়ে পালাতে দেখলো। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা খালি হয়ে গেলো। কিন্তু রাজপুত যুবক পথচারীদের জিগ্যেস করেও এর কোনো কারণ জানতে পেলো না। হঠাৎ সামনের একটা সরু রাস্তা দিয়ে সে একটা পাগলা হাতীকে ছুটে আসতে দেখলো।

রাস্তার ওপর একটা ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়েছিলো। পাগলা হাতীটি সেই রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছিলো। পথচারীরা একযোগে ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্যে চীৎকার করতে লাগলো। কিন্তু কেউ সাহস করে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলো না।

এমন সময় এক পথিক পাগলা হাতীটির সামনে লাফিয়ে পড়লো। আর চোখের পলকে দু'হাতে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে রাস্তার ওপাশে ছুটে গেলো। হাতীর পায়ের নীচে চাপা পড়তে পড়তেও ছেলেটি বেঁচে গেলো।

লাফিয়ে পড়ার সময় পথিকের পাগড়ি মাথা থেকে খুলে গিয়েছিলো। পথচারীরা দেখতে পেলো, এই পথিক আর কেউ নন, স্বয়ং সম্রাট বাবর।

যুবক রাজপুত সম্রাটের কাছে ছুটে গেলো। সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে বললো—'আপনি একজন অসম সাহসী। আমি আপনাকে হত্যা

Caption—রাজপুত যুবক সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে বললো ঃ

করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি আজ এক নতুন শিক্ষা পেলাম। আপনি দেখিয়ে দিলেন, প্রাণ হরণ নয়, প্রাণ দানের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ।'

সম্রাট রাজপুত যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন—'যুবক, তোমাকেও বেশ সাহসী মনে হচ্ছে। সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে কতল্ করার কথা বলার সাহস দেখে আমি সত্যই বিস্মিত হয়েছি। তোমার সৎ সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি আমাকে কতল্ করতে চেয়েও কতল্ করোনি। আমিও তোমাকে কতল্ করবো না, বরং তোমাকে আমি যথোচিত পুরস্কৃত করবো।'

ঃ পুরস্কার! আমাকে হত্যা করবেন না। তার বদলে পুরস্কৃত করবেন জাঁহাপনা!

ঃ হ্যাঁ, যুবক। তোমাকে আমার রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর সৈনিক নিয়োগ করলাম।

তরুণ রাজপুত কুর্নিশ করে সম্রাটের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করলো।

বাবরের পুত্রস্নেহ

সাহসী বীর ও অতুলনীয় যোদ্ধা হলে কি হবে, বাবরের অন্তরটা ছিলো স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ। সন্তানকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালো-বাসতেন। নিজের প্রাণ দিয়ে তিনি সেই সত্য প্রমাণ করে গেছেন।

সম্রাট বাবরের সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনের একবার কঠিন অসুখ হয়। হাকিম-বদ্যি সবাই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। তখন সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দরবেশ মীর আবু বাকা বাবরের কাছে

এক প্রস্তাব পাঠালেন ঃ চিকিৎসকগণ যখন হুমায়ুনের রোগমুক্তির আশা ত্যাগ করেছেন, তখন একমাত্র প্রতিকার হলো আপনার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি দান করা আর আল্লাহ্‌র কাছে আপনার পুত্রের রোগমুক্তি কামনা করা।

দরবেশের প্রস্তাব শুনে বাবর মনে মনে ভাবলেন, 'হুমায়ুনের জন্য সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস তো' আমি নিজেই। আমার চেয়ে ভালো তার আর কোনো জিনিস নেই। আমি তার জন্য জীবন উৎসর্গ করবো। দয়াময় আল্লাহ্‌ যেন তা গ্রহণ করেন।'

তারপর পুত্রের মৃত্যু-শয্যা সাত বার প্রদক্ষিণ করে বাবর আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করলেন—'হে পরোয়ারদিগার! আমার আয়ু নিয়ে প্রাণপ্রিয় হুমায়ুনের জীবন দান করো।'

বাবরের মোনাজাত আল্লাহ্‌ মঞ্জুর করলেন। আল্লাহ্‌র করুণার অন্ত নেই। এরপর ঘটলো এক অলৌকিক ঘটনা। হুমায়ুন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন। আর বাবর অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করলেন। শীঘ্রই হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং সেই অসুখে বাবর ১৫৩০ সালে ইন্তেকাল করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র আট-চল্লিশ বছর। কাবুলের 'বাগ-ই-বাবর' বাগানে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

হুমায়ুন

সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন বাবরের পুত্র। বাবরের চারপুত্রের মধ্যে তিনি সবার বড়। বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খৃস্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সম্রাট হুমায়ুন খুব দয়ালু ছিলেন। তাঁর পিতা মৃত্যুকালে তাঁকে ভাইদের প্রতি স্নেহপরায়ণ থাকতে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে বসে তিনি সেকথা ভুলে যাননি।

ভাইদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ

সম্রাট হুমায়ুনের তিন ভাইয়ের নাম ছিলো মির্জা কামরান, মির্জা আসকারী ও মির্জা হিন্দাল। সিংহাসন লাভের পর হুমায়ুন পিতার নির্দেশ অনুযায়ী তিন ভাইয়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে দিতে চাইলেন। তিনি ছোট ভাই-বোনদের খুব স্নেহ করতেন, আদর করতেন। তাই তাদের ছেড়ে একাকী রাজত্ব ভোগ করতে চাইলেন না।

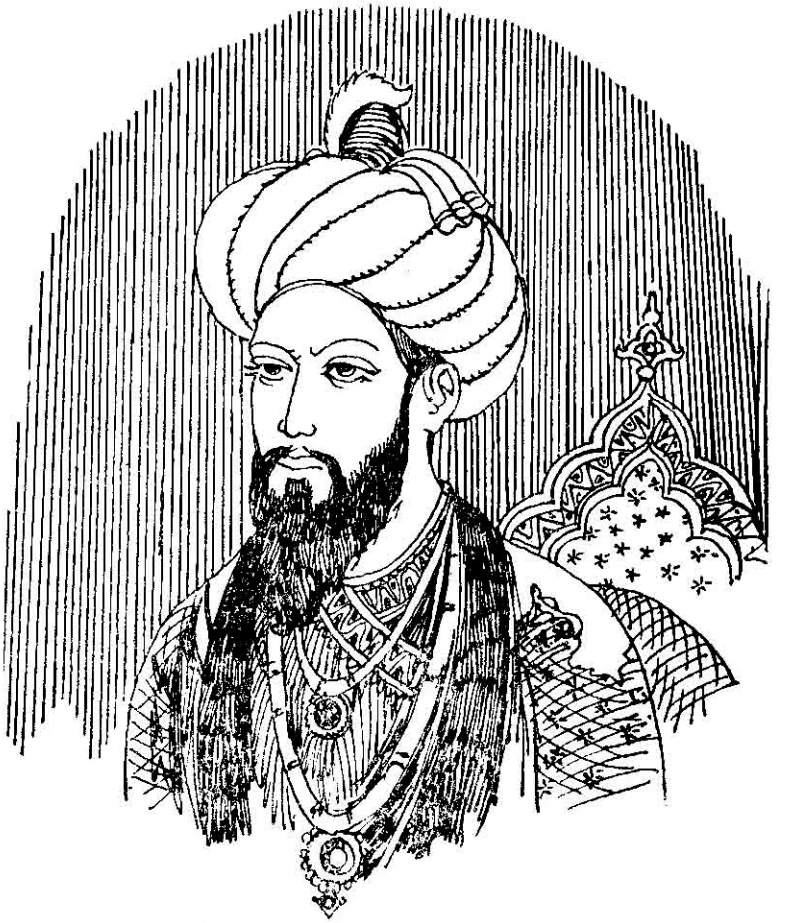

সম্রাট হুমায়ুন

কিন্তু সম্রাট হুমায়ুনের উজিরগণ তাঁর এ কাজে সমর্থন দিতে পারলেন না। কারণ, তাঁরা জানতেন, সাম্রাজ্য ভাগ করলে সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়বেন। তখন দুর্বল ও ক্ষমতাহীন সম্রাটের কথা কেউ শুনবে না, আদেশও কেউ মানবে না। তাই তাঁরা সবাই সম্রাটকে বাধা দিলেন।

তাঁরা এ কথাও জানতেন যে, সম্রাটের ভাইয়েরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে একদিন তারাই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। কিন্তু সম্রাট হুমায়ুন যে পিতার কাছে কথা দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ভাইদের তিনি বঞ্চিত করবেন না। পিতার কাছে দেয়া ওয়াদার খেলাফ তো' তিনি করতে পারবেন না!

অবশেষে সম্রাট তাঁর ওয়াদা রাখলেন। তিনি নিজের জন্য রাখলেন দিল্লী। কাবুল আর কান্দাহার দিলেন কামরানকে। মির্জা আসকারীকে দিলেন সম্বল, আর মির্জা হিন্দালকে দিলেন আলোয়ার ও মেওয়াট। চাচাতো ভাই মির্জা সুলায়মানকে নিযুক্ত করলেন বাদাখশানের শাসনকর্তা।

উজিরদের কথাই শেষ পর্যন্ত ফললো। কিছুদিনের মধ্যেই হুমায়ুনের ভাইয়েরা চক্রান্ত শুরু করে দিলো। সম্রাট হুমায়ুনকে দিল্লীর সিংহাসন থেকে অপসারণ করার মতলব আঁটতে লাগলো।

ভাইদের চক্রান্ত

ভাইয়েরা কেউই হুমায়ুনের প্রতি অনুগত ছিলো না। পৃথক পৃথক রাজ্য পেয়ে তারা নিজেদেরকে কেউকেটা ভাবতে লাগলো। কিভাবে দিল্লীর সিংহাসন কব্জা করা যায়, সেই চক্রান্তে তাঁরা হন্যে হয়ে উঠলো।

সম্রাট হবার লোভটা তাঁদের পেয়ে বসলো। ফলে, কয়েক বছরের মধ্যেই সম্রাটের তিন ভাই কামরান, আসকারী আর হিন্দাল বড় ভাই হুমায়ুনের ভীষণ শত্রু হয়ে দাঁড়ালো।

হুমায়ুনের বিচার ব্যবস্থা

সম্রাট হুমায়ুন একজন সুশাসক ছিলেন। কারো প্রতি তিনি অবিচার করতেন না। ন্যায় বিচার ছিল তাঁর ধর্ম। দেশের অতি গরীব লোকটাও তাঁর কাছ থেকে সুবিচার পেতো। বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আপন-পর ভেদ ছিলো না। ছোট-বড় ভেদাভেদ ছিলো না। বিত্তশালী আর দরিদ্রের মধ্যে ফারাক ছিলো না। তিনি ছিলেন সুবিচারক।

রাজপ্রাসাদের বাইরে একটা বিরাট ঢোল ছিলো। এই ঢোলকে বলা হতো 'বিচারের ঢোল'। যে কেউ এই ঢোল বাজিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে নালিশ জানাতে পারতো। ঢোলের আওয়াজ শুনলেই বাদশা হুমায়ুন নালিশকারীকে দরবারে ডেকে পাঠাতেন।

ঢোল বাজাবার একটা নিয়ম ছিল। কেউ যদি মনে করতো যে, তার প্রতি ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে না, তাহলে তাকে 'বিচারের ঢোল' একবার বাজাতে হতো। কেউ টাকা হাওলাত নিয়ে পরিশোধ না করলে সেই নালিশের বিচারের জন্য দু'বার বাজাতে হতো। কারো জিনিসপত্র চুরি গেলে তিনবার বাজাবার রীতি ছিলো। আর চারবার বাজালে কাউকে হত্যা করা হয়েছে বোঝাতো।

সম্রাট খুব মনোযোগ সহকারে নালিশ শুনতেন। আর অন্যায়ের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতেন। তাঁর এই ব্যবস্থায় প্রজারা অত্যন্ত খুশী হয়েছিলো। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি হুমায়ুন সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

ছোট বোন গুলবদনের আদর-যত্ন

হুমায়ুন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। ছোট ভাইদের যেমন ভালো-

বাসতেন, ছোট বোন গুলবদনকেও তেমনি স্নেহ করতেন। শৈশবকালে পিতা মারা যাওয়ায় বড় ভাই হুমায়ুন আদর-যত্ন দিয়ে বোন গুলবদনকে

লালনী-পালনী করতেন। হুমায়ুনের স্ত্রী হামিদাবানুও ননদকে খুব ভালো-বাসতেন। পিতার মৃত্যুর পর গুলবদন কেবল কাঁদতো আর কাঁদতো।

মোগল হেরেমখানার সবুজ গালিচায় বসে একদিন গুলবদন কাঁদছিলো। এমন সময় বড় ভাই সম্রাট হুমায়ুন সেখানে এসে হাজির হলেন। গুলবদন ভাইকে দেখে তাড়াতাড়ি চোখের পানি লুকোতে চেষ্টা করলো। কামিজের আস্তিন দিয়ে চোখের পানি মুছে ফেললো। তার মুখে একটা মিষ্টি হাসির আভা ফুটে উঠলো। বিস্মিত কণ্ঠে ভাইকে বললো ঃ

ঃ ভাইয়া, আপনি এখানে? দরবারে যান নি?

ঃ নারে আপু, তোকে দেখতে এলাম। আচ্ছা গুল, বল্‌তো বোন, আব্বা কি তোর একারই ছিলেন?

ঃ এ কথা বলছেন কেন ভাইয়া?

ঃ আব্বার জন্য বুঝি আমারও মন কেমন করে না?

ঃ না, মানে·····। সাত বছরের গুলবদন আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করলো।

ঃ নে, আর কাঁদতে হবে না।

ঃ ভাইয়া, অনেক চেষ্টা করেও যে চোখের পানি আটকে রাখতে পারি না। মনকে অনেক বোঝাই; কিন্তু মন মানে না। দু'চোখ ভরে কোথা থেকে যে পানি আসে!

ঃ বুঝলিরে বোকা মেয়ে, আব্বা যে আমার জন্যই জান দিলেন। আমার অসুখ না হলে তো' আর তখন তিনি মারা যেতেন না। ছিঃ আপু, ওভাবে আর কাঁদিস্ নে। আমার যে খুব কষ্ট হয়!

সম্রাট ভাইয়ের সান্ত্বনার বাণী শুনে বোন গুলবদনের কান্না থেমে যায়। আব্বার বিয়োগ-ব্যথা সে ভুলে যায়। আবার সে খেলাধুলোয় মেতে ওঠে।

আবিষ্কারের নেশা

নতুন আবিষ্কারের প্রতি হুমায়ুনের খুব ঝোঁক ছিলো। নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলে আনন্দে তাঁর মন নেচে উঠতো। এই আবিষ্কারের নেশাতেই তিনি এক ভাসমান উদ্যান রচনা করেছিলেন। সে এক মজার ব্যাপার!

একদিন তিনি নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আচ্ছা, নদীর বুকে বাগান তৈরি করলে কেমন হয়?

তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে মালীদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর কথা শুনে মালীরা তো অবাক! সম্রাটের মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি? ভাসমান উদ্যান! এও কি সম্ভব? তারা ভুল শোনেনি তো? কিন্তু না, সম্রাট আবার সেকথা বললেন। মালীদের বুদ্ধিতে ভাসমান উদ্যান তৈরির খেয়াল কিছুতেই এলো না। অবশেষে তারা সম্রাটকেই জিগ্যেস করলো—'জাহাঁপনা, গোস্তাখী মাফ করবেন। আপনার কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন কি?'

সম্রাট মালীদের করুণ অবস্থা দেখে মৃদু হেসে বললেন—'বেশ, তাহলে শোনো। বেশ কয়েকটা খোলা নৌকো নাও। শক্ত তক্তা দিয়ে পাটাতন ঢেকে দাও। প্রথম কাজ শেষ হলো। এবার ঝুড়ি-ভর্তি মাটি এনে ঐ পাটাতনের ওপর ফেলো।'

সম্রাটের নির্দেশমতো মালীরা কাজে লেগে গেলো। বেশ পুরু করে শক্ত

তক্তার পাটাতনের উপর মাটি ফেললো। এবার হুমায়ুন তাদের সেই মাটিতে ছোট ছোট চারা গাছ আর ফুলের গাছ পুঁততে বললেন। মালীরা তাই-ই করলো। তারপর ঘাসের আড়ালে লুকানো নৌকোগুলোকে যমুনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হলো। ভাসমান উদ্যান তৈরি হয়ে গেলো। যমুনা নদীতে ফুলের সমারোহ নিয়ে বাগানটা ভাসতে লাগলো।

সম্রাট হুমায়ুন তেমনি ভাসমান বাজার তৈরি করলেন। নদীপথে ভাসমান বাজার এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ফেরী করে বেড়াতে লাগলো। নৌকোর উপর সুন্দর সুন্দর সব দোকান খোলা হলো। কোনো বন্দরে ভিড়লেই ক্রেতার ভিড় লেগে যেতো। প্রজারা হুমায়ুনের এই বাজার আনন্দে গ্রহণ করেছিলো। ঘরে বসে তারা দিল্লীর জিনিস কিনতে পারতো। সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাদের মন ভরে উঠলো।

হুমায়ুনের অদ্ভুত সব আবিষ্কারের ঝোঁক কিন্তু এখানেই থেমে থাকে নি। তিনি একদিন এক কাঠের প্রাসাদ তৈরি করলেন। কাঠের সংগে কাঠ জোড়া লাগিয়ে প্রাসাদ তৈরি হলো। এই প্রাসাদ অতি সহজেই দেশ থেকে দেশান্তরে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলতো। কাঠের টুকরোর জোড়াগুলো খুলে নিলেই হলো। কাঠে চক্‌চকে রং দিয়ে বানিশ করে দেয়া হতো। আর প্রাসাদের ছাদ ছিলো সোনালী রংয়ের।

যুদ্ধের সময় নদী পারাপারে এক নতুন ফন্দী বের করেছিলেন সম্রাট হুমায়ুন। ভেলার মতো নৌকো একটার সংগে আর একটা জোড়া লাগানো হতো এপার থেকে ওপার পর্যন্ত। ব্যস্, নদী পেরুবার মতো সেতু হয়ে গেলো। সৈন্য-সামন্ত সেই নৌকোর সেতুর ওপর দিয়ে অতি সহজেই নদী পার হতো।

যুদ্ধক্ষেত্রেও হুমায়ুন সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁকে অনেক শত্রুর

বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি প্রায়ই বিজয়ী বেশে ফিরে আসতেন। তিনি জৌনপুরের মাহ্‌মুদ লোদীকে পরাজিত করেন। পরাস্ত করেন গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহ্‌কেও। তবে পাঠান শের খাঁর সংগে যুদ্ধে তিনি সফল হতে পারেন নি।

শের খাঁর বিদ্রোহ

শের খাঁর আসল নাম ছিলো ফরিদ খাঁ। তিনি ছিলেন পাঠান। বিহারের সাসারামের সামান্য এক জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন তিনি। বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার রাজ্য ছেড়ে বিহারের জায়গীরদার বাহার খাঁর অধীনে তিনি চাকুরী নেন। একটি শের অর্থাৎ বাঘ মেরে তিনি বাহার খাঁর কাছ থেকে 'শের খাঁ' উপাধি পান। সম্রাট হুমায়ুনের সংগে শের খাঁর অনেক কয়েকটা যুদ্ধ হয়েছিলো। সম্রাট হুমায়ুন কয়েকবার ধরা পড়তে পড়তেও বেঁচে গিয়েছিলেন।

শের খাঁর সংগে যুদ্ধে হুমায়ুন যে কৌশল অবলম্বন করেন, তা সঠিক ছিল না। তিনি গুজরাট অভিযান শেষ না করে গৌড়ের সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্‌কে সাহায্য করতে বাংলাদেশে আসেন। এখানে এসে গৌড় দখল করেন। গৌড় অধিকার করে খুব ধুম্‌সে সেখানে আমোদ-প্রমোদে কাটান। ওদিকে চতুর শের খাঁ বিহার আর জৌনপুর দখল করে নেন। শের খাঁকে বাধা দিতে যান হুমায়ুন। গংগাতীরে বক্সারের কাছে চৌসা বলে এক জায়গায় শের খাঁর সংগে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাঁর সৈন্যবল বেশী ছিলো না। ভাইয়েরা তাঁকে সাহায্য করেনি। সুতরাং তিনি যুদ্ধে হেরে যান।

শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাওয়াই তিনি ভালো মনে

করলেন। যুদ্ধে সেতু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। বেগতিক দেখে বাধ্য হয়েই তিনি ঘোড়াসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু নদীতে ছিলো প্রবল স্রোত। ঘোড়াটি পিঠের বোঝা নিয়ে কিছুতেই এগুতে পারছিলো না। হাতের আঘাতের দরুন হুমায়ুনও সাঁতার কাটতে পারছিলেন না। শরীরের ভারী বর্মের জন্য তিনি ডুবে যাচ্ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগলেন।

ভিস্তিওয়ালার সাহায্য

নদীর পারে এক ভিস্তিওয়ালা পানি নিতে এসেছিলো। সে সম্রাটের চীৎকার শুনতে পেলো। সে তাড়াতাড়ি তার চামড়ার মশকটি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ভিস্তিওয়ালার মশকটি বুকে চেপে ধরে সম্রাট নিরাপদে নদীর ওপারে পৌঁছলেন।

ভিস্তিওয়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় হুমায়ুনের মন ভরে উঠলো। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—'আচ্ছা ভাই ভিস্তিওয়ালা, তোমার নাম কি?'

ভিস্তিওয়ালা জবাবে বললো—'আমার নাম নিজাম, জাহাঁপনা।'

ঃ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছো। আমি এখন পালিয়ে যাচ্ছি। তাই কোনো প্রতিদান দিতে পারলাম না। তবে, তোমার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। আমি আবার যখন সিংহাসন ফিরে পাবো, তুমি আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে অর্ধেক দিনের বাদশাহ করবো।

ভিস্তিওয়ালা কুনিশ করে সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। সেও কিন্তু হুমায়ুনের অংগীকারের কথা ভোলে নি।

হুমায়ুন যখন আবার সাম্রাজ্য ফিরে পেলেন, ভিস্তিওয়ালা একদিন রাজপ্রসাদে গিয়ে হাজির হলো।

দিল্লীর সিংহাসনে ভিস্তিওয়ালা

সম্রাট তাঁর ওয়াদার কথা ভোলেন নি। তিনি ভিস্তিওয়ালা নিজামকে অর্ধেক দিনের জন্য সম্রাট পদে বরণ করে নিলেন। উজির-নাজিররা নিজামকে নতজানু হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তার আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করলেন। অর্ধেক দিন রাজত্বের পর ভিস্তিওয়ালা হুমায়ুনের কাছ থেকে প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেলো।

কৃতজ্ঞতাবোধ

আরেকবার এক যুদ্ধে হুমায়ুন ভীষণভাবে আহত হলেন। রক্তে তাঁর পোশাক ভিজে গেলো। তাঁর ভৃত্য বাহাদুর খাঁ নিজের গায়ের জামা খুলে সম্রাটকে দিলো। হুমায়ুন নিজের রক্তমাখা জামা খুলে ভৃত্যের জামা পরে নিলেন। কিন্তু তাঁর পাজামাটাও রক্তে ভিজে গিয়েছিলো। তাই তিনি রক্তে ভেজা পাজামাটা বদলাবার কথাও চিন্তা করছিলেন।

হুমায়ুন তখন একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক বুড়ি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলো। সে তাদের দেখতে পেলো। তবে সম্রাটকে চিনতে পারলো না।

হুমায়ুনের রক্তে ভেজা পাজামা দেখে বুড়ি তাদের থামালো। দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে স্বামীর একমাত্র পুরনো পাজামাখানা এনে হুমায়ুনের হাতে তুলে দিলো।

হুমায়ুন কৃতজ্ঞতার সাথে বুড়ির কাছ থেকে পাজামাটি নিলেন। তিনি বুড়িকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। বুড়ি কিন্তু খুব গরীব ছিলো। হুমায়ুনের নজর তা এড়ালো না।

রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন হুমায়ুন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি তখন সেই বুড়ির গ্রামের তহশিলদারকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তাকে বুড়ির কাছ থেকে কোনোদিন খাজনা আদায় করতে বারণ করে দিলেন।

এমনি ধরনের প্রজাহিতকর কাজের জন্য হুমায়ুনের সুখ্যাতি ছিলো।

দিল্লীর সিংহাসনে শের খাঁ

শের খাঁর সাথে কিন্তু হুমায়ুনের যুদ্ধের অবসান হলো না। শের খাঁর হাতে হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেছিলেন। আফগান সর্দার শের খাঁ ১৫৪০ খৃস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন। তারপর শের খাঁ শের শাহ নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজ্যহারা হুমায়ুন

হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের কাহিনী রোমাঞ্চকর। তাঁর এই স্বপ্ন সফল করতে তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিলো। সে-কথা বলছি, শোনো।

কনৌজের যুদ্ধে শের খাঁর কাছে পরাস্ত হয়ে হুমায়ুন দলবল নিয়ে পালিয়ে গেলেন। তিনি ভাইদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু হুমায়ুন

এখন আর সম্রাট নন। তাই ভাইয়েরা তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলো না। ভগ্ন-হৃদয়ে তিনি পারস্যের পথে রওয়ানা হলেন। তাঁর সংগে চললো তাঁর পরিবার ও সহচরবর্গ। জীবনের ভয়ে পথে তাঁকে ঝোপ-জংগলে লুকিয়ে থাকতে হতো।

আকবরের জন্ম

হুমায়ুনের কাফেলা এগিয়ে চলছিলো। কখনো দুর্গম পথ বেয়ে, আবার কখনো দুর্ভেদ্য বন-জংগলের ভেতর দিয়ে। দিন যেতে লাগলো। পথ আর ফুরোতে চাইছিলো না। পথের মধ্যে হুমায়ুনের বেগম হামিদাবানু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিন তাঁরা একটা বড় ঝোপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঝোপের আড়ালে হামিদা বানুর এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। নব জাতকের মুখ দেখে হুমায়ুনের চেহারা খুশীতে উপচে উঠলো। এতো কষ্টের মধ্যেও হামিদা বানুর দু'চোখ আনন্দের অশ্রুতে ভরে উঠলো।

হুমায়ুনের কাছে ধন-রত্ন ছিলো না। অথচ সম্রাটের পুত্র-সন্তান হলে রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে মূল্যবান উপহার বিতরণ তখনকার দিনের রেওয়াজ ছিলো। কিন্তু হুমায়ুন এখন আর দিল্লীর বাদশাহ্ নন। তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ দিল্লীর রাজকোষে বন্ধ ছিলো। পালাবার সময় তিনি কিছুই আনতে পারেন নি। তাই মূল্যবান উপহার বিতরণের প্রশ্নই ওঠে না। হুমায়ুনের কাছে ছিলো একটা সুগন্ধী কস্তুরী।

হুমায়ুনের সহচররা নব জাতককে দেখতে এলেন। নতুন শাহজাদাকে দেখে সবাই আনন্দিত। হুমায়ুন সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন।

কস্তুরীটা ভেংগে তাদের সবাইকেই একটা করে টুকরো দিলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে সবাই হুমায়ুনের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করলেন। চারদিক কস্তুরীর ঘ্রাণে আমোদিত হয়ে উঠলো। হুমায়ুন তাদের লক্ষ্য করে বললেন—'কস্তুরীর গন্ধ খুব মিষ্টি, তাই না?'

ঃ জ্বি জাহাঁপনা!—সকলে সমবেত কণ্ঠে জবাব দিলেন।

ঃ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, আমার ছেলে যেন দীর্ঘজীবী হয়। আর আমার ছেলের নামও যেন এই কস্তুরীর গন্ধের মত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

সবাই সম্রাটের সংগে হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে শাহজাদার দীর্ঘ জীবন কামনা করে মোনাজাত করলেন।

হুমায়ুন তাঁর এই নবজাত পুত্রের নাম রাখলেন আকবর।

পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ

হুমায়ুন নির্বিঘ্নে পারস্যে পৌঁছলেন। পারস্যের সম্রাট শাহ তাহ্‌মাস্‌প তাঁকে আশ্রয় দিলেন। পারস্য সম্রাটের ওখানে তাঁর দিন কাটতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মনের বল ফিরে পেলেন। তিনি হৃতরাজ্য ফিরে পাবার জন্যে মনে মনে পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

অবশেষে তাঁর পরিকল্পনা রূপ পেলো। শাহ্‌ তাঁকে একদল সৈন্য সাহায্য দিলেন।

কাবুল ও পাঞ্জাব দখল

এক শুভদিনে হুমায়ুন একদল সৈন্য আর তাঁর সহচরদের নিয়ে আফগানদের আক্রমণ করলেন। আফগান সৈন্যরা তাঁর প্রবল আক্রমণ

প্রতিহত করতে পারলো না। কান্দাহার, কাবুল ও পাঞ্জাব মোগলদের অধিকারে এলো। ফিরোজপুর আর মাছিওয়ারার যুদ্ধেও আফগান সৈন্যরা পরাজিত হলো।

দিল্লীর সিংহাসন পুনর্দখল

হুমায়ুনের সৈন্যরা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলো। ১৫৫৫ সালে তারা সিরহিন্দে পৌঁছলো। আফগান সর্দার সুলতান সিকান্দর শাহ্ আশী হাজার সৈন্য নিয়ে মোগলদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। হুমায়ুন তাঁর সৈন্যদলকে চার ভাগে ভাগ করলেন। চারদিক থেকে একযোগে বিপুল বিক্রমে আফগান সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। আফগান সৈন্যরা সেই প্রচণ্ড আক্রমণ রুখতে পারলো না। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দলে দলে পালাতে লাগলো। ফলে, হুমায়ুন যুদ্ধে জয়লাভ করলেন।

পনেরো বছর পর হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন উদ্ধার করলেন। আবার তিনি দিল্লীর সম্রাট হলেন।

হুমায়ুনের শাসন ব্যবস্থা

হুমায়ুন একজন বিচক্ষণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের সরকারকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি মাটি, বাতাস, আগুন ও পানির সংগে সংগতি রেখে বিভাগগুলোর নাম রেখেছিলেন।

যেমন, 'সরকার-ই-আব' বা পানি বিভাগ। খাল খনন, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজ এই বিভাগ দেখাশোনা করতো। 'সরকার-ই-আতস' বা অগ্নি বিভাগ। এই বিভাগ কামান, বন্দুক তৈরির কাজ

তত্ত্বাবধান করতো। 'সরকার-ই-খাকি' বা মৃত্তিকা বিভাগ। কৃষি-খামার, দালান নির্মাণ প্রভৃতি কাজ এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলো। 'সরকার-ই-হাওয়া' বা হাওয়া বিভাগ। রাজ প্রাসাদের দেখাশোনার ভার ছিলো এই বিভাগের উপর।

দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর হুমায়ুন বেশী দিন বাঁচেন নি। হুমায়ুনের একটা অদ্ভুত শখ ছিলো। আকাশের তারকারাজির প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিলো। তিনি হামেশাই রাজ প্রাসাদের ছাদে উঠে আকাশের তারা লক্ষ্য করতেন। আর আকাশের তারাগুলোই একদিন হুমায়ুনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দিলো।

একদিন হুমায়ুন তাঁর পাঠাগারের ছাদের উপর পায়চারী করছিলেন, আর সন্ধ্যাকাশের তারা দেখছিলেন। নীল আকাশের তারাগুলো দেখতে দেখতে তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তারকাপুঞ্জের ভেতর যেনো তিনি ডুবে গিয়েছিলেন। কখন যে নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিলো তিনি টেরও পাননি। হঠাৎ নামাজের কথা মনে পড়তেই তিনি তাড়াহুড়ো করে ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন। হঠাৎ একটা সিঁড়িতে তাঁর পা আটকে গেলো। ফলে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন নীচে। তিনি শয্যাশায়ী হলেন। আর উঠলেন না।

১৫৫৬ সালে সম্রাট হুমায়ুনের জীবনের অবসান ঘটলো।

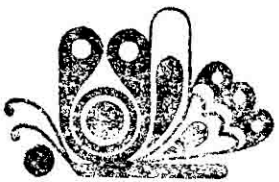

শের শাহ

দিল্লীর মসনদে অনেক বাদশাহ বসেছেন। শের শাহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

ইতিহাসে রাজা-বাদশাহ্‌দের কাহিনী লেখা থাকে। তাঁদের রাজত্বের কথা লিপিবদ্ধ থাকে। তাঁদের দোষ-গুণের কথা থাকে। তাঁদের সাম্রাজের উত্থান-পতনের বর্ণনা থাকে।

ইতিহাসে যে ক'জন সম্রাট সুশাসনের জন্য চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শের শাহ্‌। তিনি কিন্তু একদিনে দিল্লীর সম্রাট হতে পারেন নি। দীর্ঘ দিন এজন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। তবে তিনি যে একদিন দিল্লীর একজন শ্রেষ্ঠ বাদশাহ্‌র আসন দখল করবেন, ছোটোবেলা থেকেই তা তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিলো।

শের শাহের শৈশবের নাম ছিলো ফরিদ। অনুমান ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে ফরিদের জন্ম। হিসার ফিরোজা তাঁর জন্মভূমি। তাঁর পিতার নাম

মিঞা হাসান। তিনি বিহারের সাসারামের একজন জায়গীরদার ছিলেন। ফরিদের পিতা চার বিয়ে করেন। ফরিদ ও নিজাম ছিলো মিঞা হাসানের প্রথম পক্ষের সন্তান। ফরিদের পিতা ছোট বেগমকে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর অন্যান্য বেগম ও সন্তানদের উপেক্ষার চোখে দেখতেন। ফরিদকেও শৈশবকালে পিতার অনাদর ও বিমাতার অত্যাচার সইতে হয়েছিলো।

ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী

একবার এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিলো। আনুমানিক ১৫০০ খৃস্টাব্দের ঘটনা। সিকান্দর লোদী তখন দিল্লীর বাদশাহ। আর মিঞা হাসান সাসারামের জায়গীরদার।

একদিন মিঞা হাসান বৈঠকখানায় বসে আছেন। তাঁকে বেশ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিলো। প্রজাদের কথা হয়তো ভাবছিলেন। সে সময় জায়গীরের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছিলো। লুটতরাজ ছিলো নিত্য দিনের ঘটনা। প্রজারা খুব দুঃখ-কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলো। এমনি চিন্তার সাগরে যখন মিঞা হাসান নিমগ্ন, তখন একটি বালক পায়ে পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলো। বালকের নাম ফরিদ। পিতার খুব কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলো,

ঃ আব্বা!

ঃ উঁ, কে?—মিঞা হাসানের চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেলো।

ঃ আমি, ফরিদ।

ঃ কি চাই? আমাকে বিরক্ত করছো কেন?—পিতার কণ্ঠে তিরস্কার।

সম্রাট শেরশাহ

ঃ আমাকে একটা পয়সা দিন।

ঃ পয়সা? পয়সা দিয়ে কি হবে?

ঃ একটা খেলনা কিনবো।

ঃ খেলনা? ওসব আজে বাজে জিনিস কিনে পয়সা নষ্ট করতে নেই। যাও, পড়তে যাও। আমাকে আর বিরক্ত করো না। এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন বলে উঠলো—হায় আল্লাহ! একদিন যে কিনা হিন্দুস্তানের বাদশাহ হবে, তাকে একটা পয়সা দিতেও পিতার কি কার্পণ্য!' মিঞা হাসান ক্রুদ্ধ চোখে বাইরের দিকে তাকালেন। বৈঠকখানার দরজায় এক ফকীর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেলেন। ফকীর সাহেবই এ কথাগুলো বলছিলেন। ফকীর সাহেব কিন্তু মিঞা হাসানকে আর কিছু বলতে সুযোগ দিলেন না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফকীর সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিলো। ফরিদ সত্যি সত্যি একদিন শের শাহ নাম ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন।

গৃহত্যাগ

সে-তো অনেক পরের ঘটনা। তার আগের ঘটনা হলো বিমাতার অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী। পিতার অবজ্ঞা আর বিমাতার নির্দয় আচরণ বালক ফরিদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। ফরিদ একদিন সবার অজ্ঞাতে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

বিদ্যাশিক্ষা

ফরিদ কিন্তু শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বাড়ী ছেড়ে তিনি জৌনপুরে চলে এলেন। জৌনপুর তখন ছিলো

মুসলমানদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। তিনি সেখানে শিক্ষালাভে ব্রতী হলেন। পরম উৎসাহে আরবী-ফারসী পড়তে শুরু করলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি এই ভাষা দু'টো আয়ত্ত করে ফেললেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো খুব প্রখর। তিনি গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ ও সেকান্দরনামা মুখস্থ করে ফেললেন। সাহিত্য ও ইতিহাস তাঁর খুব প্রিয় ছিলো। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সাহিত্য ও ইতিহাসেও পারদর্শী হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে ইতিহাস ছিলো তার প্রিয় বিষয়। অতীতের বড় বড় বীর যোদ্ধাদের কথা ও তাঁদের মহত্ত্বের কাহিনীর প্রতি তাঁর অপরিসীম আকর্ষণ ছিলো। তাঁদের কথা পড়তে তিনি খুব ভালোবাসতেন।

পিতাপুত্রের পুনর্মিলন

জৌনপুরের শাসনকর্তা ছিলেন জামাল খাঁ। আর মিঞা হাসান ছিলেন তাঁরই অধীনে সাসারামের জায়গীরদার। ফরিদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কথা জামাল খাঁর কানে গেলো। তিনি ফরিদের পরিচয় জানতে পারলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অচিরে পিতাপুত্রের পুনর্মিলন ঘটলো। মিঞা হাসান পুত্রের প্রতি তাঁর আচরণের জন্য অনুতপ্ত হলেন। তিনি পুত্রের হাতে জায়গীর পরিচালনার ভার তুলে দিলেন।

আবার গৃহত্যাগ

জায়গীরের ভার পেয়ে ফরিদ প্রজাদের সুখ ও কল্যাণের কাজে মনোযোগী হলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চাষীরাই সমৃদ্ধির মূল। তাদের অবস্থা খারাপ হলে জমিতে ফসল ভালো হতে পারে না।

তারা সুখ-শান্তিতে থাকলে জমিতে ফসলের উৎপাদন সহজেই বেড়ে যাবে। সবলের গ্রাস থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাজার। তাই চাষীদের করের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে রাজার দায়িত্ব পালনেই রয়েছে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি।

ফরিদ কঠোরহস্তে জায়গীর শাসন করতে লাগলেন। প্রজাদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রাজ্যে সুখ ও শান্তি ফিরে এলো। কিন্তু তাঁর এই সুখ্যাতি বিমাতাকে ঈর্ষান্বিত করে তুললো। বিমাতার চক্রান্তে তিনি জায়গীর হারালেন। তিনি আবার পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন।

চাকরী ও জায়গীর লাভ

ফরিদ এবার আগ্রায় চলে এলেন। ইবরাহীম লোদী তখন দিল্লীর শাহানশাহ্। তাঁর দরবারের একজন বিখ্যাত আমীর ছিলেন দৌলত খাঁ। ফরিদ দৌলত খাঁর অধীনে চাকরী নিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের বলে তিনি দৌলত খাঁর নজরে পড়ে গেলেন। ওদিকে মিঞা হাসান ইন্তেকাল করলেন। দৌলত খাঁর অনুগ্রহে রাজকীয় আদেশ বলে ফরিদ পিতার জায়গীর লাভ করলেন।

দিল্লীর সুলতান ইবরাহীম লোদী একজন ক্ষমতাপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁর নীতি আফগানদের পছন্দ হলো না। বিহারের শাসন-কর্তা ছিলেন দরিয়া খাঁ লোহানী। তিনি দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিছুদিন পর দরিয়া খাঁ মারা গেলেন। তাঁর পুত্র বাহার খাঁ পিতার মসনদে আরোহণ করলেন। ফরিদ তাঁর অধীনে চাকরী গ্রহণ করলেন।

শের খাঁ উপাধি লাভ

ফরিদ ছিলেন এক অকুতোভয় সৈনিক। বিপদকে তিনি মোটেই ভয় পেতেন না। জীবন বাজী রেখে তিনি বিপদের সংগে লড়াই করতেন। এমনি এক দুঃসাহসিক ঘটনার বদৌলতে তাঁর নামও একদিন পাল্টে গিয়েছিলো।

সুলতান বাহার খাঁ শিকার খুব ভালোবাসতেন। তাই প্রায়ই তিনি শিকারে যেতেন। তাঁর সংগে যেতো শিকারীর দল। ফরিদ কিছুদিন হলো বাহার খাঁর অধীনে চাকরী নিয়েছেন। সুলতান শিকারে যাবার সময় এবার ফরিদকেও সংগে নিলেন। ফরিদ সানন্দে সুলতানের অনুগামী হলেন।

সুলতান ও তাঁর শিকারীর দল বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলছিলেন। সবাই শিকারের তালাশ করছিলো। এমন সময় এক বিরাট বাঘ বিকট হুংকার ছেড়ে সুলতানের সামনে লাফিয়ে পড়লো। বাঘের আকস্মিক আবির্ভাবে সবাই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। এমনকি সুলতানও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। সবাই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়লো। কিন্তু ফরিদ বিপদের মুখে একটুও সাহস হারালেন না। তিনি অত্যন্ত সাহসের সংগে বিপদের মোকাবেলা করলেন। বাঘের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আকস্মিক পাল্টা আক্রমণে বাঘ বেকায়দায় পড়ে গেলো। শুরু হলো বাঘে-মানুষে যুদ্ধ। ফরিদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিলো না। খালি হাতেই তিনি বাঘের সংগে বীরদর্পে লড়তে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ফরিদের কাছে বাঘকে পরাজয় মানতে হলো। বাঘ আস্তে আস্তে কাবু হয়ে পড়লো। ফরিদের হাতের নিষ্পেষণে এক সময় বাঘের দম বের হয়ে গেলো। বাঘ মারা গেলো।

সুলতান বাহার খাঁ ফরিদের বীরত্বে খুব খুশী হলেন। তিনি দরবারে ফিরে ফরিদকে এক নতুন খেতাবে ভূষিত করলেন। সুলতান তাঁকে শের খাঁ উপাধি প্রদান করলেন। শের মানে হলো বাঘ। বাঘ হত্যা করে তিনি খেতাব লাভ করলেন শের খাঁ অর্থাৎ ব্যাঘ্র-রাজ।

শের খাঁ নামে ফরিদের নতুন জীবন শুরু হলো। তারপর একদিন শের খাঁ নামের আড়ালে তাঁর ফরিদ নাম বিস্মৃত হয়ে গেলো। ইতিহাসে তিনি শের খাঁ নামেই পরিচিত হয়ে রইলেন।

জায়গীরচ্যুত শের খাঁ

শের খাঁর কার্যদক্ষতায় বাহার খাঁ খুব খুশী হলেন। তিনি তাঁকে নিজের সহকারী নিযুক্ত করলেন। আর সে সংগে পুত্র জালাল খাঁর শিক্ষক নিয়োজিত করলেন। শের খাঁ বাহার খাঁর অধীনে চার বছর দক্ষতার সংগে কাজ করেন। তারপর তিনি নিজের জায়গীরে ফিরে আসেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন আবার তাঁকে জায়গীর থেকে বিতাড়িত হতে হলো।

ইতিহাস গতিশীল। চন্দ্র-সূর্যের মতো আপন গতিতে ইতিহাস এগিয়ে চলে। শের খাঁর জীবনের ইতিহাসও নিজের গতিতে নতুন পথে ধাবিত হলো।

মোগল সাম্রাজ্য

কাবুলের অধিপতি বাবর। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য ১৫২৬

খৃস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। দিল্লীর সুলতান ইব্‌রাহীম লোদীর সংগে পানিপথে তাঁর তুমুল লড়াই হলো। ইব্‌রাহীম লোদী পরাজিত ও নিহত হলেন। বাবর দিল্লীর মসনদ অধিকার করলেন। আর সে সংগে প্রতিষ্ঠা করলেন মোগল সাম্রাজ্যের।

হৃতরাজ্য পুনরধিকার

শের খাঁ এবার বাবরের শরণাপন্ন হলেন। বাবর তাঁকে রাজকীয় সৈন্যদলে চাকরী দিলেন। এই অবসরে শের খাঁ মোগলদের সমর ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। দেড় বছর পর বাবরের সহায়তায় তিনি পুনরায় নিজের জায়গীর ফিরে পেলেন।

ইবরাহীম লোদীর মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতা বিরাজ করতে লাগলো। এ ফাঁকে বাহার খাঁ সুলতান মুহাম্মদ নাম ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। কিছুকাল পর তাঁর ইন্তেকাল হলে তাঁর নাবালক পুত্র জালাল খাঁ বিহারের শাসনকর্তা হলেন। তাঁর মা তখন শের খাঁর সাহায্যে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কিছুদিন পর তিনিও ইন্তেকাল করলেন। শের খাঁ তখন বিহারের প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে বসলেন।

আফগান নেতা শের খাঁ

১৫৩০ সালে শের খাঁ চুনার দুর্গের উত্তরাধিকারিণী লাল মালেকাকে বিয়ে করলেন। এর ফলে তিনি প্রচুর ধন-দওলতসহ সুদৃঢ় চুনার দুর্গের অধিকার লাভ করলেন।

ইতিমধ্যে বাবর ইন্তেকাল করলেন। হুমায়ুন দিল্লীর মসনদে বসলেন। হুমায়ুন শের খাঁকে চুনার ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু শের খাঁ হুমায়ুনের আদেশ মানতে রাজী হলেন না। আর এভাবেই আফগান আর মোগলদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হলো।

বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। তিনি রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জন্য বিহার আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি বিহারের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু শের খাঁর কাছে তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজয় বরণ করলো। সুলতান মাহমুদ শাহ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আবার বিহার আক্রমণ করলেন।

ওদিকে শের খাঁর কর্তৃত্বে জালাল খাঁ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। শের খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তিনি সুলতান মাহমুদ শাহের সংগে যোগ দিলেন। কিন্তু এবারও শের খাঁ সুলতান মাহমুদ শাহের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করলেন। জালাল খাঁ পালিয়ে বাংলাদেশের সুলতানের দরবারে আশ্রয় নিলেন। এবার শের খাঁ বিহারের স্বাধীন নৃপতি রূপে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

শের খাঁ নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে অল্পকালের মধ্যেই আফগানদের নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

শের খাঁ হলেন শের শাহ

শের খাঁর শক্তি বৃদ্ধির খবর শুনে হুমায়ুন তাঁকে দমন করতে চাইলেন। দুশমনের শক্তিকে বাড়তে দেয়া ঠিক নয়। তিনি চুনার

দুর্গ দাবী করলেন। কিন্তু শের খাঁ এ দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে, ১৫৩২ খৃস্টাব্দে হুমায়ুন চুনার অবরোধ করলেন। কিন্তু ওদিকে গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দিলো। তাই তিনি বাধ্য হয়ে চুনারের অবরোধ তুলে নিলেন।

হুমায়ুন গুজরাট অভিযান শেষ করে আবার চুনার অবরোধ করলেন। ছয় মাস অবরোধের পর চুনার মোগলের হস্তগত হলো। হুমায়ুন যখন চুনার অবরোধে ব্যস্ত, তখন শের খাঁ বাংলাদেশে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শের খাঁর সেনানায়ক খাওয়াস খাঁ গৌড় অধিকার করেন। গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহ পালিয়ে গিয়ে হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় নিলেন।

চুনার দুর্গ শের খাঁর হাতছাড়া হয়ে গেলো। কিন্তু তাতে তিনি দমলেন না। তিনি তখন এক হিন্দু রাজার কাছ থেকে রোটাস দুর্গ কৌশলে অধিকার করে নিলেন। রোটাস দুর্গ সুদৃঢ় ও নিরাপদ বলে বিখ্যাত ছিলো। তিনি তাঁর ধনরত্ন ও পরিবার-পরিজনকে এ দুর্গে এনে রাখলেন।

হুমায়ুন এদিকে বাংলাদেশ দখল করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। ওদিকে শের খাঁর এক পুত্র তেলিয়াগিরি গিরিপথে মোগল সৈন্যদের বাধা দিতে থাকেন। শের খাঁ রোটাস দুর্গে তাঁর ধনসম্পদ স্থানান্তরের কাজ শেষ করে তাঁর পুত্রকে তেলিয়াগিরি ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড়ে প্রবেশ করলেন। এটা ছিলো শের খাঁর একটা যুদ্ধ-কৌশল। তিনি কৌশলে হুমায়ুনের সংগে আগ্রার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে কৌশল কার্যকরী হলো। হুমায়ুন সহজেই শের খাঁর ফাঁদে পা দিলেন।

হুমায়ূন যখন গৌড়ে, শের খাঁ সে ফাঁকে চুনার দুর্গ উদ্ধার করে নিলেন এবং কনৌজ পর্যন্ত দেশ জয় করলেন।

হুমায়ূন দেখলেন, দিল্লীতে ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ হবার উপক্রম। তখন তাঁর চেতনা ফিরে এলো। তিনি দুশমনের মোকাবেলা করতে অগ্রসর হলেন। হুমায়ূন মুংগের পর্যন্ত বিনা বাধায় অগ্রসর হলেন। শের খাঁ তাঁর অগ্রযাত্রায় বাধা দিলেন না। তিনি বিহারের চৌসা নামক স্থানে হুমায়ূনের পথ রোধ করলেন। শের খাঁ আবার কূট-নীতির পথ অবলম্বন করলেন। এবারও হুমায়ূন শের খাঁর কৌশল ধরতে পারলেন না। রাতের অসতর্ক মুহূর্তে শের খাঁ মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। আকস্মিক এ আক্রমণে মোগল সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়লো। অনেক চেষ্টা করেও হুমায়ূন লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারলেন না। ১৫৩৯ খৃস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকালে গংগা নদীতে ডুবে মরবার উপক্রম হলো। নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালা তার মশকের সাহায্যে হুমায়ূনের জীবন রক্ষা করে।

চৌসার লড়াইয়ে জয়লাভ করে শের খাঁর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেলো। হুমায়ূনের পরাজয়ের খবর পেয়ে মোগলরা চুনার, জৌনপুর ও গৌড় ছেড়ে চলে গেলো। শের খাঁ বাংলা, বিহার ও জৌনপুরের সর্বময় কর্তা হয়ে পড়লেন। তিনি আর দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করতে চাইলেন না। তাই ১৫৩৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'শের শাহ' উপাধি ধারণ করেন এবং নিজেকে স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করে গৌড়ের মসনদে আরোহণ করলেন।

পাঠান সম্রাট শের শাহ

চৌসার যুদ্ধেই কিন্তু মোগল-পাঠানের বিবাদের শেষ হলো না। রাজধানীতে ফিরে হুমায়ুন সৈন্য যোগাড় করতে লাগলেন। হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য আবার শের শাহকে আক্রমণ করলেন। ১৫৪০ খৃস্টাব্দের ১৭ই মে হিন্দুস্তানের মসনদের জন্য মোগল-পাঠানে লড়াই শুরু হলো। এই যুদ্ধ কনৌজের যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। অবশেষে বহু কষ্টের পর তিনি পারস্য রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শের শাহের রণ-কৌশলের জয় হলো। তিনি বিনা বাধায় আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করলেন এবং ৫৩ বছর বয়সে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করলেন।

হিন্দুস্তানের রাজমুকুট মোগলের শির থেকে পাঠানের শিরে গিয়ে শোভা পেলো।

হুমায়ুনকে পরাস্ত করেই শের শাহ চুপচাপ বসে রইলেন না। তিনি পাঞ্জাব জয় করলেন। অন্যদিকে তাঁর সেনাপতিরা মুলতান ও সিন্ধু জয় করলেন। জয়ের নিশান উড়িয়ে শের শাহ ১৫৪২ খৃস্টাব্দে মালব অধিকার করলেন। গোয়ালিয়র ও রনথম্‌বোর দুর্গও তাঁর করতলগত হলো। ১৫৪৩ খৃস্টাব্দে তিনি মালবের রায়সিন দুর্গ জয় করলেন। ১৫৪৫ খৃস্টাব্দে তিনি যোধপুররাজ মালদেওকে পরাজিত করলেন। ফলে, আজমীর থেকে আবু পর্বত পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল শের শাহের অধিকারে এলো।

শের শাহের ইন্তেকাল

কালিঞ্জর অভিযান ছিলো শের শাহের জীবনের শেষ যুদ্ধ। তিনি স্বয়ং কালিঞ্জর অবরোধ করলেন। কালিঞ্জর দুর্গ এক উঁচু মালভূমির

উপর অবস্থিত ছিলো। এ দুর্গ ছিলো দুর্ভেদ্য। কিন্তু শের শাহের অসাধারণ উদ্যম আর অবিচল দৃঢ়তার কাছে সেই দুর্ভেদ্য দুর্গও পদানত হলো। এক বছর অবরোধের পর তিনি কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করলেন। কিন্তু সে মুহূর্তে নিজ পক্ষের একটি কামান বিস্ফোরণের ফলে শের শাহ ভয়ংকররূপে আহত হলেন। কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারের বার্তা শোনার পরক্ষণেই তিনি ১৫৪৫ খৃস্টাব্দের ২২শে মে ইন্তেকাল করলেন।

শাসক শের শাহ

শের শাহ মাত্র পাঁচ বছর দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শের শাহের আসল পরিচয় কিন্তু যুদ্ধজয়ী বীর হিসেবে নয়, সুশাসক হিসেবে। সামরিক বিজেতার চেয়ে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক-রূপেই শের শাহ বেশী সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে তাঁর মতো সুশাসক খুব বেশী জন্মান নি। এতোদিন ধরে ওয়াজির নামে এক শ্রেণীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী প্রজাদের সংগে বাদশাহ্‌র যোগাযোগের মাধ্যম ছিলো। ফলে, ওয়াজিররা অত্যাচারী হলে প্রজাদের আর দুর্ভোগের সীমা থাকতো না। আবার ওয়াজিররা ক্ষমতালোভী হলে বাদশাহ্‌র পক্ষে তাদের দাবিয়ে রাখা মুশকিল হতো। যেহেতু প্রজাদের সংগে বাদশাহ্‌র সরাসরি যোগাযোগ ছিলো না।

শের শাহ ওয়াজির প্রথা তুলে দিলেন। প্রজাদের সংগে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

তখনকার শাসন ব্যবস্থায় আর একটি চলতি প্রথা ছিলো জায়গীর প্রথা। এই প্রথা মাফিক রাজকর্মচারীরা মাস-মাইনের বদলে জমির

অধিকার পেতো। পুরুষানুক্রমে সে জমির মালিকানা অযোগ্য উত্তর-সূরীদের কাছে চলে যেতো।

শের শাহ জায়গীর প্রথা তুলে দিলেন। তার বদলে রাজকর্মচারীদের মাস-মাইনে বেতন চালু করলেন।

শের শাহ শাসন-সংস্কারে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। প্রজাদের কল্যাণই ছিলো এই সংস্কারের উদ্দেশ্য।

শের শাহ সমগ্র সাম্রাজ্য সাতচল্লিশটি সরকারে ভাগ করেন। প্রত্যেক সরকারকে আবার কয়েকটি পরগণায় ভাগ করেন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পরগণা গঠিত হলো। প্রত্যেক পরগণায় একজন করে শিকদার, আমীন, খাজাঞ্চী, মুন্সেফ এবং দু'জন করে কারকুন নিযুক্ত করেন। কারকুন দু'জনের মধ্যে একজন হিন্দী এবং অন্যজন ফারসী ভাষায় দলিল-দস্তাবেজ ও হিসেব-পত্র রাখতেন। তাছাড়া, জনসাধারণ ও রাজ-কর্মচারীদের মধ্যস্থরূপে কাজ করার জন্য পাটওয়ারী, চৌধুরী ও মোকাদ্দম নিযুক্ত করেন।

আমীন কর ধার্যও সংগ্রহ করতেন। শিকদার তাঁর ফৌজীদল নিয়ে পরগণার শান্তি রক্ষা করতেন।

পরগণার উর্ধতন বিভাগ হলো সরকার। সরকার কয়েকটি পর-গণার সমষ্টি। প্রত্যেক সরকারের উপর একজন শিকদার-ই-শিকদারান বা প্রধান শিকদার এবং একজন মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান বা প্রধান মুন্সেফ থাকতেন। তাঁরা পরগণার রাজকর্মচারীদের কাজ তদারক করতেন। প্রত্যেক কর্মচারীকেই দু-তিন বছর পর স্থানান্তরে বদলী করা হতো। ফলে, তারা দুর্নীতিপরায়ণ হবার সুযোগ পেতেন না।

ভূমি সংস্কারক

শের শাহ জমি জরিপ করে সরাসরি প্রত্যেক কৃষকের সংগে তাঁর ভূমি রাজস্ব স্থির করতেন। উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হতো। নগদ অর্থে বা দ্রব্যের সাহায্যে রাজস্ব শোধ করার ব্যবস্থা ছিলো। সরকার প্রজার কাছ থেকে কবুলিয়ত নিতেন এবং তাদেরকে পাট্টা দিতেন। প্রজারা সরকারের কাছ থেকে জমি নেয়ার সময় তাদের কর্তব্যের শর্তগুলো লিখে সরকারকে দিতো। একে কবুলিয়ত বলা হতো। তেমনি জমির উপর কৃষকের স্বত্ব স্বীকার করে সরকারের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে কৃষকদের দলিল দেয়া হতো। একে বলা হতো পাট্টা।

শের শাহ রাজা-প্রজার স্বার্থ অভিন্ন বলে মনে করতেন। খাজনা কম করে ধরলে প্রজারা সহজেই তা শোধ করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া, দেশে দুর্ভিক্ষ, অজন্মা বা দুর্যোগের সময় তিনি কৃষকদের রাজকোষ থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন।

মুদ্রা সংস্কারক

শের শাহ মুদ্রা সংস্কার করেন। তিনি প্রচলিত পুরনো মুদ্রা টংকা তুলে দিলেন। তার বদলে নতুন মুদ্রা রুপিয়া চালু করলেন। এই রুপিয়া থেকে আধুনিক কালের টাকা প্রবর্তিত হয়।

শের শাহ ব্যবসায় নীতির পুনর্গঠন করেন। তার ফলে, দেশের ধ্বংসোন্মুখ বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হলো। তিনি কণ্টকর অনেক শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন।

শান্তি রক্ষক

শের শাহ গ্রামের শান্তিরক্ষা ও আসামী ধরে দেয়ার জন্য গ্রামের প্রধানদের দায়ী করতেন। গ্রাম প্রধানদের এলাকায় চুরি বা ডাকাতি হলে, চোর বা ডাকাত ধরা না পড়লে, এজন্য গ্রাম প্রধানদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হতো। কোনো নরহত্যাকারীর খোঁজ না পাওয়া গেলে গ্রাম প্রধানকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হতো। এর ফল খুব চমৎকার হয়েছিলো। রাজ্য থেকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব লোপ পেয়ে গিয়েছিলো।

শের শাহ নিজস্ব সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন। পূর্বে দিল্লীর সুলতানের নিজস্ব সৈন্যদল ছিলো না। আমীর ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারাই দরকারের সময় সৈন্য দিয়ে সম্রাটকে সাহায্য করতেন। এতে সৈন্যদের সংগে সম্রাটের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো না। তারা শুধু নিজের মনিবকেই চিনতেন। অনেক সময় মনিবের আদেশে সম্রাটের বিরুদ্ধেও তারা অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হতো। শের শাহ নিজের সৈন্যদল গঠন করলেন। ফলে, সম্রাটের সংগে সামান্য সৈনিকেরও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

সৈনিকরা যাতে সুবিচার পায়, শের শাহ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। অপরাধ করলে বড় বড় আমীররাও তাঁর শাস্তির কবল থেকে রেহাই পেতেন না।

একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিলো। শুজাৎ খাঁ ছিলেন শের শাহের একজন আমীর। একবার তিনি তাঁর সৈন্যদের প্রাপ্য ভূমির হিস্‌সা থেকে কিছু অংশ নিজে আত্মসাৎ করে ফেলেন। এতে সৈন্যদলে অসন্তোষ দেখা দিলো। তারা শুজাৎ খাঁর প্রতি খুব রুষ্ট হলো।

তাঁর অধীনে আর কাজ করতে চাইলো না। দু'হাজার ক্রুদ্ধ সৈন্য তাঁর শিবির ছেড়ে চলে গেলো। এ সংবাদ শের শাহের কানে পৌঁছুলো। তিনি শুজাৎ খাঁর উপর ভীষণ চটে গেলেন। শুজাৎ খাঁর কৃতকর্মের নিন্দা করে তীব্র ভাষায় এক চিঠি লিখলেন। চিঠি পেয়ে তো শুজাৎ খাঁর অবস্থা কাহিল। যে সকল সৈন্য চলে গিয়েছিলো তাদের কাছে ছুটলেন। তাদেরকে অনেক অনুনয়-বিনয় ও নানান উপহার দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর বিপদ কোনোমতে কাটলো। শের শাহের ক্রোধ এবারকার মতো এড়াতে পারলেন বলে গরীব-মিস্‌কিনদের দান-খয়রাৎ এবং দরগা ও মসজিদে মিষ্টি বিতরণ করে আল্লাহ্‌র শুকুর-গুজার করলেন।

শের শাহ নিজে সৈন্য নির্বাচন করতেন এবং তাদের বেতন ধার্য করতেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক সৈনিকের বেতন নিজ হাতে দিতেন। তদুপরি, তিনি অশ্বের জন্য দাগ প্রথা চালু করেছিলেন। সেনাপতিরা যাতে ঠকাতে না পারে, সেজন্য তিনি এ ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থায় ঘোড়ার কপালে দাগ দেয়া হতো এবং এদের গায়ের রং ও আকৃতি লিখে রাখা হতো।

জনগণ অধিনায়ক

জনহিতকার্যের জন্য শের শাহ ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং ডাক চলাচলের জন্য নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরনো সড়ক মেরামত করেন। আগে দেশে রাস্তাঘাটের অভাব ছিলো। শের শাহ বড় বড় রাস্তাঘাট তৈরি করে সেই অভাব দূর করেন। এগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম সড়ক বাংলাদেশের

সোনার গাঁ থেকে পাঞ্জাবের সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তা দেড়হাজার ক্রোশ লম্বা। বর্তমানে এই সড়ক 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামে পরিচিত।

পথিকের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপণ ও দুই ক্রোশ পর পর একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। প্রত্যেক সরাই-খানাতে একটা কূপ ও একটি মসজিদ ছিলো। মসজিদের জন্য একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন রাখা হতো।

সরাইখানা নির্মাণের ফলে দেশে এক নবজীবনের সাড়া পড়ে গিয়ে-ছিলো। এই সরাইখানাগুলোর দ্বারা শের শাহের ডাক-চৌকীর কাজও চলতো। প্রত্যেক সরাইখানাতে চিঠি ও লোক বহনের জন্য ঘোড়া রাখা হতো। এর ফলে, সংবাদ আদান-প্রদান দ্রুত ও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হতো।

শের শাহের গুণাবলীর কথা বলে শেষ করা যায় না। স্থাপত্য শিল্পেও তিনি কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। তিনি বহু দুর্গ নির্মাণ করেন। তারমধ্যে পাঞ্জাবের রোটাস, দিল্লীর পুরান-কিল্লা ও সাসারামে তাঁর সমাধি ভবন বিখ্যাত। শের শাহের সমাধি ভবন তাঁর পুত্র সলিমের আমলে শেষ হয়েছিলো। তা ছাড়াও, শের শাহ অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও পথঘাট নির্মাণ করেন।

শের শাহ দিল্লী নগরীর সীমা বাড়িয়ে যমুনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

শের শাহের রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিলো। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর অনন্য সাধারণ কাজের জন্য ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সুবিচারক

শের শাহ একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। বিচারের বেলায় তাঁর কাছে আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে কোনো ভেদ ছিলো না। ন্যায়ের দণ্ড সবার উপর সমান ছিলো। বিচারে কোনোদিন তিনি পক্ষপাতিত্ব করেননি কিংবা কারো প্রতি কখনো অবিচার করেন নি। তাঁর দরবারের বড় বড় আমীরও অন্যায় করলে বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেতেন না। এমনকি তাঁর প্রিয় পুত্রেরাও আইনসংগত শাস্তি থেকে রেহাই পেতেন না।

এমনি এক বিচারে তিনি নিজের পুত্রকে দণ্ড দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেননি। বড় শাহজাদা একটু বেশী আদর-যত্নে মানুষ হয়েছিলেন। তাই তাঁর চরিত্রে কিছুটা বেপরোয়া ভাব ছিলো।

একবার শাহজাদা নগরে বেড়াতে বের হয়েছেন। তিনি রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক পথচারী আর তার স্ত্রী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা শাহজাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়াতে গেলো। কিন্তু পথিকের স্ত্রী সরে দাঁড়াবার আগেই শাহজাদার ঘোড়ার সামনে পড়ে গেলো। শাহজাদা ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি পথিকের স্ত্রীর সংগে বেশ দুর্ব্যবহার করলেন। পথিক স্ত্রীর প্রতি শাহজাদার আচরণে বেশ ক্ষুব্ধ হলো।

পরদিন সেই পথিক বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির হলো। শের শাহ তখন দরবারে বসে আমীর-ওমরাহদের সংগে আলোচনা করছিলেন। পথিককে দেখে তিনি চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন—

ঃ কি চাই তোমার?

ঃ আপনার দরবারে আমার ক্ষুদ্র এক নালিশ আছে, জাহাঁপনা।—লোকটা বিনয়ের সংগে তাঁর আরজি পেশ করলো।

ঃ নালিশ? কিসের নালিশ? বেশ বলো, তোমার নালিশ। শের শাহ লোকটাকে তাঁর অভিযোগ নির্ভয়ে বলার অনুমতি দিলেন।

ঃ জাহাঁপনা গোস্তাকি মাফ করবেন, গতকাল বড় শাহজাদা পথের মধ্যে আমার স্ত্রীর সংগে দুর্ব্যবহার করেছেন। তারপর পথিক গতকালের ঘটনার বিবরণ পেশ করলো।

শের শাহ শাহজাদার এই অশালীন আচরণের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তক্ষুনি শাহজাদাকে তলব করলেন। শাহজাদা দরবারে হাজির হলেন।

শের শাহ তখন শাহজাদার অন্যায় আচরণের রায় ঘোষণা করলেন—'পথিক, তোমার স্ত্রীর সংগে শাহজাদা গতকাল যে ধরনের অশালীন আচরণ করেছে, তুমিও আজ তার বেগমের সংগে ঠিক তেমনি অশালীন আচরণ প্রকাশ করবে।'

শের শাহের রায় শুনে আমীর-ওমরাহের দল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা শের শাহকে তাঁর হুকুম বদলাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁদের কোনো অনুরোধ-উপরোধই শের শাহের হুকুম রদ করতে পারলো না। তিনি তাঁদের বললেন—'বিচারের সময় আমার কাছে প্রজা আর শাহজাদার মধ্যে কোনো ফারাক নেই।'

কর্মী শের শাহ

শের শাহ অত্যন্ত প্রজাবৎসল বাদশাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কর্তব্যপরায়ণ সুলতান। এই আদর্শে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

তাই রাজ্যের মংগলের জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি সময় ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে সব কাজ পরিদর্শন করতেন। ফলে, দেশে সুশাসন কায়েম হয়েছিলো।

সেনাপতি শের শাহ

শের শাহ একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রণ-কৌশলে মোগল সেনাপতিরাও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু শৌর্য-মায়ায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। গ্রীক দেশের বীর আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা পুরু তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। আলেকজান্দার ও পুরুর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিলো। যুদ্ধে পুরু পরাজিত হয়েছিলেন। পরাজিত দুশমন পুরুকে তিনি বীর-শ্রেষ্ঠ আলেকজান্দারের কাছে কি ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করেন জিগ্যেস করেছিলেন। নির্ভীক পুরু উত্তর দিয়েছিলেন, বীরের ন্যায়। আলেকজান্দার পুরুর জবাব শুনে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিংগন করেছিলেন। এমনি ছিলো আলেকজান্দারের শৌর্য-মায়া। ঠিক তেমনি শৌর্য-মায়ার অধিকারী ছিলেন শের শাহ।

সহৃদয় শের শাহ

শের শাহ ছিলেন এক হৃদয়বান পুরুষ। দুশমনের দুঃখেও তাঁর হৃদয় গলে যেতো। শৌর্য-মায়া আর সহৃদয়তার বিশেষ গুণে শের শাহ ছিলেন অনন্য। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের মহিষীর সংগে আন্তরিক আচরণে।

চৌসার যুদ্ধের পরের ঘটনা। মোগল সম্রাট হুমায়ুন যুদ্ধে পরাজিত। বীরত্বের সংগে লড়াই করেও তিনি জয়লাভ করতে পারলেন না। তিনি নিজেও আহত হলেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি গংগা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রবল স্রোতে তিনি ভেসে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ভিস্তিওয়ালা তাঁকে দেখতে পেলো। ভিস্তিওয়ালা হুমায়ুনের প্রাণ রক্ষা করলো। হুমায়ুন আগ্রার দিকে পালিয়ে গেলেন।

মোগল সৈন্য পরাজিত হলো। হুমায়ুনের পরিবারবর্গ শের খাঁর বন্দী হলো। এ ঘটনার পর হুমায়ুনের মহিষী একদিন বহু মহিলা পরিবেষ্টিত হয়ে শের শাহের সামনে হাজির হলেন। হুমায়ুন শের শাহের দুশমন ছিলেন। তা'বলে তিনি হুমায়ুনের মহিষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে কুন্ঠিত হলেন না। বরং একজন বাদশাহ্‌র মহিষীর করুণ অবস্থা দেখে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি।

একজন দুশমনের বেগমের প্রতি সহৃদয় আচরণ শের শাহের কোমল প্রাণের পরিচায়ক।

নিরহংকার শের শাহ

শের শাহ একজন নিরহংকারী বাদশাহ ছিলেন। তিনি শৃংখলার প্রতি ছিলেন কঠোর, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিলো নরম। তাঁর কঠোরতা সত্ত্বেও সৈন্যরা শের শাহকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতো। শের শাহও ভক্তি আদায় করে নিতে জানতেন। তিনি একজন সাধারণ সৈনিককেও আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। তার কাজের তারিফ করতেন। তিনি অনেক সময় সৈনিকদের সংগে নিজেও কাজে নেমে যেতেন। সৈন্যরা তাদের সেনাপতির একাজ দেখে আরো উৎসাহ বোধ করতো।

একবারের ঘটনা। চৌসার যুদ্ধের আগের ঘটনা। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের দূত চৌসায় আফগান শিবিরে এসেছেন। তিনি মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে এক জরুরী বার্তা নিয়ে আফগান সেনাপতি শের শাহের কাছে এসেছেন। দূত শিবিরের প্রহরীর কাছে আপন পরিচয় দিয়ে তাঁকে আফগান সেনাপতি শের শাহের কাছে নিয়ে যেতে বললেন।

প্রহরী সম্মানিত দূতকে পথ দেখিয়ে এক পরিখার কাছে নিয়ে এলো। কয়েকজন সৈনিক প্রখর সূর্য কিরণ উপেক্ষা করে জামার আস্তিন গুটিয়ে পরিখা খনন করছিলো। তাদের গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিলো।

প্রহরী আংগুল দিয়ে কার্যরত একজন সৈনিকের প্রতি ইংগিত করে দেখিয়ে দিলো ঃ ইনিই শের শাহ। দূত বিস্ময়ে হতবাক! শের শাহকে সাধারণ সৈনিকের সংগে আস্তিন গুটিয়ে কোদাল দিয়ে পরিখা কাটতে দেখে তিনি যেনো তাঁর চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। শের শাহ পরিখা থেকে উঠে এলেন। দূতের কুশল জিগ্যেস করলেন। তারপর স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন।

দুর্ধর্ষ আফগান সৈন্যদের সংগে এভাবে আপন হয়ে মিশতে পেরেছিলেন বলেই শের শাহ তাদের ভক্তিভাজন হতে পেরেছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিকের শিরোপা এনে দিয়েছিলো।

আদর্শ বাদশাহ

শের শাহ ছিলেন এক অসাধারণ পুরুষ। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। তিনি অনন্য সাধারণ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী

হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি একাধারে ন্যায়পরায়ণ, উদার, ধর্মভীরু, কর্মবীর, কূটনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, পণ্ডিত, কৃতী শাসক ও বীর সেনানায়ক ছিলেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বলে তিনি দীন অবস্থা থেকে উপমহাদেশের সম্রাটের আসন অলংকৃত করতে পেরেছিলেন।

শের শাহ একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল, এবং শিক্ষা ও শিল্পকলার উৎসাহদাতা।

শের শাহ মধ্যযুগের একজন আদর্শ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন।